দেশি ধান অবলুপ্তির পথে—
খাদ্য স্বনির্ভরতার অন্তিমযাত্রার সূচনা

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

এশিয়া ও ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মতো পশ্চিমবঙ্গেও ধান একটি প্রধান শস্য। বাংলায় ধান অবশ্য শুধু প্রধান শস্যই নয় এখানকার কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গেও এই শস্যচাষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর কোনো পথে 'নরম ধানের গন্ধ' খুঁজতে বেরিয়ে পথে এসে মিশবে এই গ্রাম বাংলারই শ্যামলিম ধানখেতে। প্রায় চারহাজার আটশো ধানের জাত নিয়ে এই বিপুল জৈব সম্ভার ছিল এই পশ্চিমবঙ্গের। ভারতে ছিল প্রায় ৪২ হাজার ধানের জাত ও ১ লক্ষ ২০ হাজার রকম (Strain) ধান। এর মধ্যে কোনোটি সুগন্ধী, কোনোটি বা উচ্চফলনশীল, কোনোটি খরা- বন্যা সহনশীল কিংবা রোগপোকা সহনশীল। কতই না বৈচিত্র্য তার। বঙ্গের কবি সাধে বলেননি—

'কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে"

কিন্তু সেই উর্বরা প্রাণবন্ত মাটির বিচিত্র স্বর্ণালি সম্ভার আগ্রাসী ও লোলুপ বহুজাতিকের লোভাতুর নিশ্বাসে বিনষ্ট হওয়ার পথে। কৃষিক্ষেত্রে এই দহন সমস্ত কিছু পুড়িয়ে খাক্ করার আগে আমাদের সচেতনতার সঙ্গে প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। দ্রুততায়। দৃঢ়তার সঙ্গে।

পিছন পানে তাকাই

সবুজ বিপ্লবের 'বৈপ্লবিক' ক্রিয়াকর্ম :—

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ভারত সরকারের জমিদারি আইন বিলোপ এবং সেই দশকেরই শেষ দিকে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি, যেমন প্রশাসনিক পরিকাঠামো ব্যবস্থা স্থাপন, ঋণদান সংস্থা ও ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে কৃষিঋণ দিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বৃদ্ধির প্রচেষ্টা খুব একটা সাফল্যের মুখ দেখল না। অথচ ক্ষুধার্ত কৃষক তখন শাসকের কাছে ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সেইসময় পি. এল. ৪৮০ কর্মসূচির মাধ্যমে আমেরিকা থেকে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিশেষত গম আমদানি করতে হল। সামাজিক অবস্থা যাতে বিস্ফোরক না হয়ে ওঠে সেজন্য ষাটের দশকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও রকফেলার ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে গঠিত হল কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (CGIAR)। এরাই সারা পৃথিবীর সঙ্গে এদেশের আধা সামন্ত্রতান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতির ওপর একটা নতুন কৃষিনীতি ওপর থেকে চাপিয়ে দিতে তৎকালীন সরকারকে সাহায্য করেছিল। দেশে বিদেশে সাময়িকভাবে কৃষক শ্রেণিকে প্রশমিত করার একটা উপায় বের হল যেটি হল 'সবুজ বিপ্লব'। ফিলিপাইনের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে স্বস্তিতে চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি আমেরিকার কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তাঁরা তাঁকে ক্ষুধা আর কমিউনিজম জয় করার অমোঘ অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। যাইহোক সবুজ বিপ্লব কর্মসূচিতে ও তার ঠিক পরপরই ভারতে নিয়ে আসা হল ধান ও গমের হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি (HYV) অর্থাৎ বহিরাগত পিতামাতা থেকে তৈরি উচ্চফলনশীল জাত যা প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক ও সেচের জলের সাহচর্যে বেশি ফলন দেবে। খাদ্যশস্য উৎপাদন জগতে এই পরিবর্তনই 'সবুজ বিপ্লব' নামে অভিহিত করা হল। ঐ উচ্চফলনশীল ধান ও গমের জাতগুলি কৃষি রাসায়নিক উপকরণের প্রচুর ভোক্তা ছিল, সেজন্য বিজ্ঞানী ডঃ পামার এর গুণাগুণ বিচার করে নামকরণ করেন HRV (High Responsive Variety)। ধানের ক্ষেত্রে এই জাতগুলি ছিল আমাদের দেশি ধানের চেয়ে খর্বাকৃতি। তাইওয়ানের ডি জি ও উ-গেনের সঙ্গে দেশিজাতের সংকরায়নে সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল। International Rice Research Institute থেকে, ইন্দোনেশিয়ার জাত পেটা (Peat) ও IR-8ও অন্যান্য আরও কয়েকটি বহিরাগত HYV জাত (Exotic HYV) সরকারি কর্মসূচির হাত ধরে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের অনেক রাজ্যেই। সরকারি প্রশাসনের সক্রিয়তায় সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করে, ঋণ, সংস্থা থেকে কৃষিঋণ গ্রহণ করে শুরু হল 'সবুজ বিপ্লব'। নতুন জাতের তথাকথিত 'আশ্চর্য বীজ' (Miracle Seed) ও কৃষি পদ্ধতি ভারতের কৃষক রপ্ত করতে শুরু করল। কিন্তু অসুবিধা হল তথাকথিত ঐ HYV গুলির রাক্ষুসে খিদে নিয়ে। প্রচুর রাসায়নিক সার, কীটনাশক না ঢাললে উপযুক্ত সাড়া দেবে না তারা (ডঃ বন্দনা শিবা, ১৯৯১) শুধু তাই নয় দেখা গেল প্রতি একক জল ব্যবহারে উচ্চফলনশীল বীজ বেশির ভাগ দেশি ধানের থেকে কম উৎপাদনশীল (উভান্স ১৯৯৩, দেব ২০০০)।

প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ডঃ নরম্যান বোরলগ এরপর ভারতে এলেন। বিশেষত HYV গম উৎপাদনে ভারতের অগ্রগতি দেখে তিনি পুলকিত হয়ে বললেন, ''There is a prospect of a spectacular break-through in grain production for India'' ধানের ক্ষেত্রেও সেই একই মনোভাব। সরকারি অনুদানে পুষ্ট ঐসব HYV ম্যাজিক বীজের দাপটে বেশির ভাগ দেশি জাতের পুরোনো ধান হারিয়ে যেতে লাগলো। কেউ কোন খবরই রাখলেন না, কত গুণসম্পন্ন এক-একটা সম্পদ পৃথিবী থেকে চিরতরে লোপ পেয়ে গেল। হাজার হাজার বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা পারেনি কয়েক বছরের মধ্যে মনুষ্যকৃতভ্রান্ত প্রযুক্তি প্রয়োগে তাই হয়ে গেল। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন, খাদ্য স্বয়ম্ভরতা বজায় রাখতে জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতেই হবে অর্থাৎ দেশি ধানের জাতগুলিকে অবশ্যই সংরক্ষিত করতে হবে। সরকারকে কৃষিনীতিতে এই বিষয়টি

অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ কর্মসূচিও গ্রহণ করতে হবে। সরকারি খামারে এবং চাষির মাঠে স্থানীয় দেশি ধানের চাষ করে সেগুলি বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আদিম যুগ থেকে মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ও কাঙ্ক্ষিত গুণের ঐ সমস্ত জাতের সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে এই সুবিপুল জিন ভান্ডার থেকে জিন গ্রহণ করে আরও নতুন গুণসম্পন্ন জাত আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। একথা মনে রাখা দরকার একই জাতের (variety) বা কয়েকটি মাত্র জাতের শস্য বারবার চাষ করলে বা দেশিজাতের বিচিত্র সম্ভারকে অবহেলায় লুপ্ত হতে দিলে বংশানুগত (জিনগত) বৈশিষ্ট্য ক্ষয়িষ্ণু হবে এবং ধীরে ধীরে প্রজাতিটিই হঠাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে। কাজেই এইভাবে যে-কোন খাদ্যশস্যের উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে খাদ্য স্বনির্ভরতায় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। যেমন গ্রেট ব্রিটেনে একটি রোগের প্রাদুর্ভাবে আলু ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছিল।

সবুজ বিপ্লবের আরও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ফল :-

সবুজ বিপ্লবের কয়েক বছরের মধ্যেই শুরু হল আরও কিছু নেতিবাচক প্রভাব 'বিদেশ থেকে তৈরি করা HYV গুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ও প্রাকৃতিক অন্যান্য পোষক উদ্ভিদের অবলুপ্তির জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ প্রবলভাবে বেড়ে গেল। বেশ কিছু অপ্রধান কীটপতঙ্গ প্রধান কীটশত্রু হিসেবে আবির্ভূত হল। অন্যদিকে দেশিজাতের ধানগুলো একই বাস্তুতন্ত্রে বহু বছর থাকতে থাকতে রোগপোকা সহনশীল হয়ে উঠেছিল হঠাৎ আসা হাই - ইল্ডিংজাতের সেই সুযোগ ছিল না। কাজেই সবুজ বিপ্লবের ফসল HYV জাতের ঐ ধানগুলোর রোগপোকা আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাষিকে ছড়াতে হলো প্রচুর কৃষিবিষ। বাজার ছেয়ে গেল নানা কোম্পানির কৃষিবিষে। পরিবেশ প্রকৃতি বিষে নীলকণ্ঠ হল, মাটি, জল, বাতাস জুড়ে কত উপকারি জীবের নিধন হল কে তার হিসাব রাখে? তথাকথিত সভ্যতা আর মুনাফাসন্ধানী নব্য কৃষিপ্রযুক্তির বলি হতে হল অনুজীব (Micro organism), কেঁচো, সাপ, ব্যাঙ, মাছ, বোলতা, ফড়িং, পাখি আরও কত উপকারি অসহায় জীবকে। র‍্যাচেল কারসন লিখলেন 'The Silent Spring'—নীরব বসন্ত। বসন্তকালের পাখির গান আর শোনা যাবে না। জমির অবস্থানগত দিক দিয়েও HYV ধান আমাদের দেশিয় পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। উঁচু আর নীচু জমিতে ঐ ধরনের ধানের ফলন বেশ কম হওয়ায় সেই সব জমি পতিত পড়ে থাকল।

খর্বাকৃতি হাই-ইল্ডিং জাতের অত্যধিক জলের চাহিদা থাকায় মাটির নীচের জল পাম্প করে তোলার কাজ শুরু হল। মাঠে মাঠে সরকারি বদান্যতায় বসল শ্যালো, ক্লাস্টার আর ডিপ টিউবওয়েল । মাটির ভৌম জল ক্রমাগত তোলার ফলে আর্সেনিক দূষণ, আয়রনের সমস্যা ইত্যাদি দেখা দিল। মাটির ভৌত অবস্থার ওপর নেতিবাচর প্রভাব পড়তে লাগল। একই জমিতে রাসায়নিক সারের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াতে থাকায় মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হল। নাইট্রোজেনের আধিক্যজনিত দূষণ বৃদ্ধি পেল। মাটিতে অণুখাদ্যজনিত (বোরন, মলিবডেলাস, তামা ইত্যাদি) অভাব দেখা দেওয়ায় দেশি - বিদেশি কোম্পানির দ্বারস্থ হতে হল চাষিকে, খরচ বাড়ল বহুগুণ। প্রচুর সার, কীটনাশক, জল, হরমোন ইত্যাদি ব্যবহার করে বাড়তি চারবস্তা ফলন হল বটে কিন্তু ক্ষতি হল দীর্ঘমেয়াদি।

'পোড়ো জমি, খাল, নদীপথ।

শীতে মৃত শিশির ঝরে পড়ছে সূর্যমুখীর ডালে ডালে ফুল তবু ফোটে না! সেখানে হেমন্ত রাত্রি শেষের ক্লান্ত পদধ্বনি শুনে শুনে শেফালি বালিকার মৃত্যুবরণ করেছে সে মাটি এখন বন্ধ্যা! ইতিহাসের কি মির্বোধ পরিহাস'

মাটির জলস্তর নেমে গেল। মাটির বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে বন্ধ্যা হতে আর বাকি থাকল না। পুকুর, জলাশয়, খাল, বিল কৃষি বিষে দূষিত হল। ঘর ছাইবার খড় পাওয়া যায় না। বিষাক্ত ফসল খেয়ে ক্যানসার, ডায়রিয়া, অ্যালার্জি, নার্ভের রোগ ইত্যাদি নানা রোগের প্রকোপ বেড়ে গেল। জমির উৎপাদনশীলতা কমতে থাকল। এসব জিনিস উন্নয়নের হিসাবে বিবেচিত হবে না। এসব কথা আজ আধুনিক প্রযুক্তি বিরোধী হবে।

বিজ্ঞাপনে আকাশ ঢাকে :—

তথাকথিত আধুনিক কৃষির জয়যাত্রা অব্যাহত। 'কৃষিতে আমাদের অগ্রগতি রুধিবে কে?', 'কৃষি ও কৃষকের উন্নতিতে আমরা', 'অমুক কোম্পানির সার ব্যবহার করে সোনার ফসল ঘরে তুলুন। অমুক সার ব্যবহারে ফলন যেন লাফিয়ে বাড়ে' ইত্যাদি সরকারি - বেসরকারি ঢক্কনিনাদে চরম সত্যটি চাপা পড়ে যাচ্ছে মেঘে ঢাকা তারার মতো। বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাবেকি ধানের জাতের সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে সেইসব ধান চাষের কৃৎকৌশলগুলোও। কি রকম জমিতে কোন জাতের ধান চাষ করতে হবে, কোন ফসলের পর কোন ফসল চাষ করলে জমির উর্বরতা রক্ষা পাবে, কোন জাতটির চাষে জল কম লাগবে, কোন ধান চাষ করলে রোগে ভোগা রুগীর পুষ্টি হবে— এইসব তথ্যভান্ডার ক্রমশ অবলুপ্ত হবে। আধুনিক পাশ্চাত্য কৃষি সংস্কৃতি শেষ করে দিচ্ছে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরাদাতা মানুষের মনকেও।

দেশিয় ধানের জাতগুলি সংরক্ষণ তাই খুবই জরুরি :—

জীববৈচিত্র্যে ধানের প্রজাতির অবলুপ্তি ঠেকিয়ে রাখতে অর্থাৎ মানবজাতির খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থেই দেশি ধানের জাতগুলির সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। এই সম্পর্কে ১৯৪৫ সাল থেকেই কটকের Central Rice Research Institute (CRRI) -এর প্রাক্তন অধিকর্তা প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ আর. এইচ. রিচারিয়া

প্রচুর মূল্যবান কাজ করেছেন। তিনি বারবার বিদেশি উচ্চফলনশীল ধানের ক্রমাগত চাষের নেতিবাচর দিকগুলি তুলে ধরে নীতিনির্ধারকদের সজাগ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশে বহুদিন তিনি উচ্চফলনশীল দেশি জাতগুলো চিহ্নিত করার কাজ করেছেন। দেখা গেছে আদিবাসী অধ্যুষিত বস্তার জেলায় মক্‌দো নামে একটি দেশিজাত ৩৭০০ কেজি—৪৭০০ কেজি প্রতি হেক্টারে ফলন দিয়েছেন, ঐ রাজ্যেরই রায়পুরে 'চিনার' নামে একটি দেশিজাত হেক্টারে ৪৪০০ কেজি ফলন দিয়েছে। যেগুলি কোনো অংশেই তথাকথিত বিদেশি পিতামাতা থেকে তৈরি হাই ইল্ডিং জাতের ফলনের থেকে কম নয়। উপরন্তু মধ্যপ্রদেশের রাজ্য কৃষি প্রতিবেদনে দেখা গেছে ঐ সমস্ত দেশি উচ্চফলনশীল জাত পরিবেশের রোগপোকা সহনশীল হওযায় রাসায়নিক বিষ কম প্রয়োগ করতে হয় এজন্য চাষের খরচ কম লাগে পরিবেশ দূষণও হয় না। চিলকাট, কানকচুড়ি, বাঁশগাটি ইত্যাদি খরা সহনশীল জাত নিয়েও তিনি কাজ করে ভালো ফল পেয়েছেন। যেখানে সবুজ বিপ্লবের ফসল তথাকথিত উচ্চফলনশীল জাতের ফলন উঁচু ও নীচু জমিতে মুখ থুবড়ে পড়ে সেখানে দেশিজাতগুলো অভিযোজিত হয়ে বেশ ভালো ফলন দেয়। এখনো মধ্য প্রদেশ এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও কোনো কোনো অঞ্চলে খরা ও রোগপোকা সহনশীল সুগন্ধী ধানের জাত পাওয়া যায়। তবে কতদিন পাওয়া যাবে বলা মুশকিল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে ডঃ রিচারিয়া মধ্যপ্রদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রে ও চাষির মাঠে ক্লোনাল প্রোপাগেশান প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশি জাতের ধানের ফলন প্রচুর বাড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ তার বিপুল জার্মপ্লাজম বৈচিত্র্য নিয়ে ধানের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হোক, এতে কৃষিক্ষেত্রে বিদেশি নির্ভরতা ও খরচ অনেক কমতো কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের সুচারু কারসাজিতে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়নি।

লুণ্ঠিত মহামূল্যের জিন সম্পদ :—

লুণ্ঠনকারীর দল যুগে যুগে এসে ভারতের মহামূল্যবান ধনসম্পদ লুঠ করে নিজের দেশে নিয়ে গেছে। মহামূল্য জিন সম্পদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৯৭৪ সালে আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন আর রকফেলার ফাউন্ডেশনের যৌথ প্রয়াসে তৈরি হয় 'International Board of Plant Genetic Resources' (IBPGR) খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (FAO)-এর পরিকাঠামো ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে তারা জমা করতে থাকে। সেই সমস্ত দেশের সরকারের এসবের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না। শোনা যায় কয়েকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীও আমাদের দেশ থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহে পরোক্ষে সহায়তা করেছিলেন। বর্তমানে পৃথিবীর মোট জার্মপ্লাজমের প্রায় এক-চতুর্থাংশ IBPGR-এ গচ্ছিত আছে। কিন্তু সেই সব জার্মপ্লাজমের কোনো সেট্ সংগ্রহ করা দেশগুলিতে নেই। এবারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ঐ জার্মপ্লাজম ব্যবহার করে নানা গুণসম্পন্ন শস্যের জাত আবিষ্কার করে পেটেন্ট নেবে আর লক্ষ জলারে তা বিক্রি করবে সেই সমস্ত দেশে যেখান থেকে তাদের জার্মপ্লাজম তুলে আনা হয়েছিল।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদেরই সচেতন প্রতিরোধ করতে হবে:—

আশার কথা মানুষ এখন জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জিন সম্পদের কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। অনেক এন. জি. ও., বিজ্ঞান ও পরিবেশ সচেতন সংগঠন মানুষের মধ্যে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা, জৈব পঞ্চায়েত আন্দোলন, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা, জৈব পঞ্চায়েত আন্দোলন, জীব বৈচিত্র্যে সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য সচেতন করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে প্রচারের কাজ করছেন। দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। সভ্যতাকে খুঁজে নিতে হবে অরণ্য এবং প্রকৃতির কোলেই। সাবেকি শস্যের বীজে সাবেকি পদ্ধতিতে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে চাষ তাই পশ্চাদ্‌পদ চিন্তা নয়। সমস্ত মানুষেরই তা বোঝার সময় এসেছে। চাষবাস শুধু গ্রামীণ মানুষ, গ্রামীণ কৃষকের ভাববার বিষয় নয় শহরবাসী মানুষকেও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে বিস্ময়বোধ ও একাত্মতা জাগিয়ে তুলে সকলে মিলেই আর একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১। The Violence of Green Revolution- Vandana Shiva.

২। Industrial Vs. Ecological Agriculture- Debal Deb.

৩। অনীক অক্টোবর ২০০৪, ১৯৮৩ সেপ্টেম্বর অক্টোবর

৪। Human Development Report 1999

৫। The Life and Work of Dr. R. H. Richharia- Bharat Dogra.